অগ্নিচুলি–

নাসরীন জাহান

শেফালিদের বাড়িতে মিলিরা যখন পৌঁছায়, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। মাটির রাস্তা ধরে রিকশা করে ওরা যখন যাচ্ছে, আশপাশের অনেক মানুষই ভীত সন্ত্রস্তভাবে মিলিদের দিকে তাকাচ্ছিল। পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হওয়ায় এবং স্থানীয় সন্ত্রাসীদের তৎপরতায় ওদের বাড়ির অনেক দূর থেকেই পুরো এলাকা থমথমে।

রিকশা থামিয়ে ক্ষেতে কাজরত একজন বৃদ্ধকে ওরা জিজ্ঞেস করে, আপনি কি শেফালিদের বাড়িটা চেনেন?

বৃদ্ধ হতচকিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজের সরলতা লুকায়, কুন শেফালির কথা কইতাছেন? এই গেরামে তো অনেক শেফালি। ওই যে আজগর প্রামাণিকের মেয়ে…।

মিলির কথা শেষ হয় না, লোকটি মুহূর্তে উল্টোমুখী হাঁটতে থাকে। না, আমি কুন শেফালি টেফালিরে চিনি না।

অন্য সব গ্রামে ধান কাটার উৎসব। এই গ্রামেও যোজনব্যাপি জমি, ছেলে বুড়ো কন্যা সবাই ধান কাটছে, কিন্তু কোনো উৎসব নেই। কেউ কিছু না বললেও বোঝা যায়, পুরো অঞ্চল জুড়ে একটা চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কেবল ধুলোবাতাস আর মেঘ ঢেকে রাখা সূর্য ভাপের মিহি কোলাহল। শস্যের সাথে শাস্ত্রের শ্বেতাভ ধ্বনি… তাই হাওয়ায় ভেসে এসে এক অদ্ভুত শস্যগন্ধ নিয়ে আসে যা যেকোনো শহুরে মানুষের স্নায়ুর বিভ্রম ঘটিয়ে দেয়ার মতো।

প্রথমে বাস, তারপর স্টপেজে নেমে রিকশা– যাকেই ওরা হিরণপুরের কথা জিজ্ঞেস করে, সেই একটা অদ্ভুত চাহনি দিয়ে তাকায়। একটা রিকশা ভাড়া করে যেতে যেতে মিলি প্রশ্ন করে, ভাই, আপনি কি শেফালিদের বাড়িটা চেনেন? রিকশাওয়ালা ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলে– না।

কী ভাবছ এত? এতক্ষণ তারেক নিজেও ছড়ায়িত নিঃশব্দ নবান্ন দেখছিল যেন।

মিলি বলে, হিসাব মতো আমরা অলরেডি পঁচিশ মিনিট আগে রিকশায় উঠেছি, আর দশ মিনিট পরই রাস্তার ডান পাশে বড় হিজল গাছ, বাঁয়ে পুকুর, তার ওপারেই বাঁশঝাড়-ঘেরা বাড়িটা থাকার কথা।

তারেক হাসে, আমার তো কত গাছকেই হিজল গাছ মনে হলো আসতে আসতে কত বাঁশঝাড়ই তো দেখলাম।

মিলি ফের চেষ্টা করে, ও রিকশাওয়ালা ভাই, শেফালিদের বাড়িটা আসলেই আপনে চিনেন না? ওই যে, যে মেয়েটার ওপর অত্যাচার হলো, যাকে এসিড দিয়ে…।

দেহেন, আপনেরা হিরণপুরের ভাড়া ফুরাইছেন। এইডাই হিরণপুর। অহন আপনেরা নাইম্যা যার বাড়ি খুঁইজ্যা লন, আমরা চৌধুরী বাড়ি, সিকদার বাড়ি চিনি, শেফালি বাড়ি চিনি না। পুলিশ এসেছে, ঢাকা থেকে লোক এসেছে, তারেক অসহিষ্ণু, তারপরও তার বাড়িটা চিনছেন না? একটা মেয়ের ইজ্জত নষ্ট হলো, কত লোক এলো ঢাকা থেকে, পত্রিকায় কত লেখা হলো। রিকশাওয়ালা গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, এই দুইতিন গেরামে কত মাইয়ারই তো ইজ্জত নষ্ট হইতাছে, এইসব নতুন কী! কুন সময় যে কেডা পপুলার হয়া যায়, দেন ভাই ভাড়া দেন।

রিকশাওয়ালার 'পপুলার' শুনে মিলি খানিক হোঁচট খেয়ে কাঁদবে কী হাসবে বুঝে উঠতে পারে না। সে তাদেরকে ইশারা করে বলে– হি কান্ট হেল্প মি. ওয়েলডান, আমরা একাই চেষ্টা করি চলো।

ধুলোর স্তূপ স্যান্ডেল গড়িয়ে সালোয়ারের প্রান্ত ভরিয়ে ফেলছে। এর মধ্যেই দু'জন হাঁটে। আবারো সেই বুনো ঘ্রাণের আচ্ছাদন, আর আসমানের শূন্যতা ধরে সারবেঁধে একেবারে ছক কেটে উড়তে থাকা হাঁস বলাকারা।

ঘরে ঘরে রেইপড মেয়েগুলি লজ্জায় সুইসাইড করছে, সেখানে আবার কেউ একই ঘটনায় পপুলার হয়? হাউ ফানি! তারেক বিমর্ষ কণ্ঠে বলে।

তুমি রিকশাওয়ালার টিজটা ধরতে পারলে না? পপুলার শব্দটা সে পজেটিভ সেন্সে ব্যবহার করেছে বলতে চাও? হাঁটতে গিয়ে মিলি খানিকটা ওষ্ঠা খেতে গিয়ে তারেকের হাত ধরে নিজেকে সামলে নেয়… গ্রাম বলো, শহর বলো, তারেক সবার চোখই এখন খোলা। এইসব কয়টা নিউজ পেপারে আসে? কালার হওয়ার ভয়ে, মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কত ফ্যামিলিই তো এইসব চেপে যাচ্ছে। এর মধ্যেও যে কয়টা নিউজ আসে, পড়তে পড়তে আমরাই টায়ার্ড হয়ে যাই। আমাদের প্রতিষ্ঠানও তো বলতে গেলে একশ জনের মধ্যে মানে যদি গড়ে পাঁচজনের সুস্থতার দায়িত্ব নিতে পারি, বাকি কত পেসেন্টকেই তো সীমাবদ্ধতার কারণে ইগনোর করতে বাধ্য হই।

মিলি ওই যে সামনে ছাপড়া মত কিছু দোকান, তারেক উদ্ভাবিত দেখি ওরা কোনো হেল্প করে কিনা।

ক্লান্ত পা হেঁচড়ে মিলি সেইসব টি-স্টলের সামনে গিয়ে অবাক। কোনো সাধারণ গ্রামবাসী নেই। তিনটি দোকানের বেঞ্চই দখল করে রেখেছে মাস্তানগোছের কিছু ছেলে…।

ওই লইট্যা, মাঙ্গির পুত চা বানাইতে সিলেট গেছস নাকি? বলে কিম্ভূত পোশাক পরা লম্বা চুলের এক ছেলে মিলির মুখের ওপরই ধোঁয়া ছোড়ে– শেফালির বাড়ি খুঁজতাছেন নাকি?

মানে… মিলি হঠাৎ ইতস্তত বোধ করে, আপনারা কী করে জানলেন? খেক খেক করে হাসে একজন। কী যে কন, আমরা তারে নিয়া ফিলিম বানাইলাম, তারে ইস্টার বানাইলাম, আমরা চিনুম না? অহন

আপনারা পত্রিকায় কভারেজ দিতাছেন...।

মিলির ভেতরটা ওদের কোরাস অট্টহাস্য ধ্বনি শুনে মুহূর্তে কেঁপে ওঠে। একেবারে খোলা আকাশের নিচে বসে মৌজ করে আড্ডা দিচ্ছে শেফালিকে কেটে ছিঁড়ে টুকরো করা জন্তুগুলো! তাহলে আসামি পালিয়ে বেড়াচ্ছে, পুলিশ ওদের খুঁজছে এসব তথ্যের ভিত্তি কী?

একজন দাঁড়ায়, ভাবলাম গরমী কইমা গেছে, একটু শান্তি মতো বইতে আইলাম, আপনেরা যে কী চান... বসেন, শেফালির বাড়িতে আমিই আপনাগোরে নিয়া চলি।

তারেক বলে– না না, শুধু চিনিয়ে দিন।

আরে! আমাগো এলাকায় শহরের অতিথি আইছেন... চলেন। আশপাশের জমি, কুঁড়েঘরের সরলতা, বিকেলের মিহি বাতাসের ঝিরিঝিরি মুহূর্তে চারপাশ থেকে অন্তর্হিত, গলায় মাফলার, তালি দেয়া প্যান্ট, ভারি লাল গেঞ্জি পরা ধূমপানরত দানব আকৃতির মানুষটি ছাড়া মিলি-তারেকের সামনে পেছনে আর কিচ্ছু নেই।

কে বলবে এ-ও একজন গ্রামবাসী?

কুন পত্রিকা থাইক্যা আইছেন?

আমরা মানে...।

মিশনে আইছেন, বুকের মইদ্যে তাগদ নাই, ডরান ক্যান?

মিলি কণ্ঠে স্পষ্টতা আনে, আপনি এই গ্রামেরই ছেলে?

দুনিয়াডাই আমাগো গেরাম শহর। আমি সিকদার বাড়ির বড় পোলা। শহরেই থাকি, ইলেকশানের সময় গেরামে আইছিলাম, হেরপর আর কী গেরামের মায়ায় আটকায়া গেলাম।

লোকটাকে আপনি করে সম্বোধন করতে মিলির শরীর রিরি করছে। কিন্তু যেন এখনই সে প্রথম নিজের অসহায়ত্ব টের পায়, এদেরকে ক্ষেপিয়ে কিছু লাভ নেই, মিলি আর শেফালিতে এদের কাছে কী পার্থক্য? আরে জোরে হাঁডেন, পকেট থেকে আরেকটা সিগ্রেটের বাক্স বের করে সে, রাইতে থাকনের মতলব লইয়া আইছেন নাকি? তারেক বলে-না, আমাদের আজকেই শহরে ফিরতে হবে।

তা শেফালি... ওই ছোবড়া লইয়া লড়াচড়া করতে আইছেন ক্যান? দেশে তাজা মালের অভাব পড়ছে নাকি?

দেখুন, আমরা কোনো পত্রিকা থেকে আসি নি। আমরা একটা পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে এসেছি, মিলি বলে, এখানকার শহরে আমাদের ব্রাঞ্চ আছে। রাতের মধ্যেই ফিরতে হবে। আমরা শেফালির বাবা-মা'র সাথে কিছু কথা বলতে এসেছি।

অ...। তা ভালা কতা। কিন্তু আগেই সাবধান কইরা দিতাছি, কুন উল্টাসিদা কতা জিগাইবেন না, এমনিতেই ওরা পেরেশানির মইদ্যে আছে। এছাড়া রাইতে ফিরন তো নিরাপদ না, আপনেগো হাতেও তো টাইম নাই।

ইঙ্গিতটা তারেক-মিলি দুজনেই বোঝে। এক তেতো বিষাক্ত অনুভূতি শরীর বেয়ে বেয়ে উঠতে উঠতে গলায় এসে আটকে যায়।

একটি মৃত গ্রামের মরাটে বাড়িতে পা রাখতে রাখতেই হেসে যেতে থাকা দুপুরটা গড়িয়ে পড়ে।

কই গো শেফালির মা? ঢাকা থাইক্যা মেহমান আইছে, বাইর হয়া আহো। এক মাঝবয়সী মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের তিনজনকে দেখে বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জলচৌকি আনো, বইতে দেও, কইরে মজিদা সালেমা, ডাক পারতাছি কানে যায় না?

উঠোনের এক কোণে হুঁকো খাচ্ছিল ভেঙে পড়া শরীরের এক জীর্ণ বৃদ্ধ, সে কম্পিত হাতে মাটিতে হুঁকো নামিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। দুটি কিশোরী মেয়ে জবুথবু ভঙ্গিতে এসে জলচৌকি নিয়ে এসে চলে যেতে উদ্যত হলে ছোকড়াটা আবার ভক করে সিগ্রেটের ধোঁয়া ঠেলে বলে, তোরা কই যাস? কানে যায় না ঢাকার মেহমান আইছে? তোগো বেবাকের সঙ্গে বাতচিৎ করবার চায়, বাবলুরে দেখতাছি না, ও কই?

ঘোমটারত মাঝবয়সী কম্পিত কণ্ঠে মিলিকে বলে, বহেন। অপূর্ব হাওয়াস্পন্দনময় বিকেলটা যেন ঢেকে যেতে থাকে কৃষ্ণপুঞ্জ মেঘে। মিলির শিরায় শিরায় কী যে হয়, এই বাকস্তব্ধ মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে ড্রাকুলা অঞ্চলে, এদের খড়চালাময় বাড়ির চারপাশ প্রদক্ষিণ করে আছে, বেড়া নয়, বাঁশঝাড় নয়, অনেক অদৃশ্য এবং একজন দৃশ্যমান রাক্ষস।

তাদের পা গেঁথে যেতে থাকে মাটিতে। তার পুরুষরক্ত মাটিকে ক্ষণিকে ক্ষণিকে গরম হচ্ছে। ওই ভুতোমুখো ছোকড়াটার মুখ থেকে টেনে সিগ্রেট নিয়ে সবার সামনে জিপার খুলে যদি ওর নিম্নাঙ্গে ঠেসে দেয়া যেত!

নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক ভেবে এক ধরনের অবসাদের পথ ধরে হাঁটারত তারেকের নিজের ভেতরের এই বিবর্তন নিজেকে অবাক করে যেমন, অসহায়ও করে তেমন। কিশোরী দুটি শেফালির বোন। সব তথ্য নিয়েই এসেছে ওরা। ওদের বাবা-মা'র কাছে শেফালি অতীত। এই দুটি বর্তমান মেয়েকে অন্ধকার থেকে বাঁচাতে সন্ত্রাসীদের বর্ণিত শেফালিই নষ্টা, সে-ই দশ পুরুষের সাথে থেকে টাকা উপার্জন করত এই কথা পর্যন্ত বলতে রাজি।

না, যেভাবে পুরো এলাকা আড়াল করে ছোকড়াটি দাঁড়িয়ে আছে, এদের মুখ থেকে কিছু জানা যাবে না।

শুনেছি, মিলি নোটবই বের করে তারপরও চেষ্টা চালায়, এরকম একটা পাশবিক ঘটনা ঘটার পরও আপনারা কোনো মামলা করেন নি, কেন? ক্লাসে পড়া না পারা ছাত্রটিকে যখন কোনো টিচার সবার মধ্যে কোনো প্রশ্ন করেন, সে আদৌ তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে কিনা এটা না বুঝতে চেয়ে আশপাশের স্টুডেন্টদের দিকে তাকায়, এদেরও সেই দশা হয়। বৃদ্ধ তাকায় মাঝ বয়সীর দিকে, কিশোরীরা বৃদ্ধের দিকে।

আরে কও ডর কী? ছোকড়াটা আশ্বাস দেয়, মন খুইল্যা কও, এত দূর থাইক্যা কষ্ট কইরা উনারা আইছেন।

আপনিই তো শেফালির মা?

মাঝবয়সী মাথা নাড়েন, হ্যাঁ।

আপনার নাম আম্বিয়া খাতুন, আর উনি আপনার স্বামী বৃদ্ধ হকচকিয়ে মাথা নাড়তে না নাড়তেই ছোকড়াটি কুশ্রী ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওঠে, বেবাকই তো জানেন দেখতাছি, তা নতুন কী শুনবার আইছেন? আপনেরা উকিল নাকি?

ওকে তোয়াক্কা না করে তারেক প্রশ্ন করে– ফাঁকা স্কুলের মধ্যে সারারাত ধরে আপনাদের মেয়ের ওপর অত্যাচার হলো, মেয়েটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর খুন হলো ওর চাচাতো ভাই, এরপর ডাক্তারের সহায়তায় আবার ওকে হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে ছয়জন মিলে আবার জঙ্গলে নিয়ে দিনরাত ধরে ওর ওপর পাশবিক অত্যাচার করল, তার সারা শরীর এসিডে পুড়িয়ে দিল, ও আপনাদের মেয়ে না? কেন মামলা করেন নি?

মা-ম-লা? বৃদ্ধ যেন ঝেড়ে বসে, কার বিরুদ্ধে মামলা করুম? আমরা তো কাউরে চিনি না।

একটা কিশোর নিঃশব্দে বাঁশঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। মিলি সন্তর্পণে দেখে এবং কী বুঝে ছেলেটিকে না দেখার ভাণ করে মাঝবয়সীর মুখোমুখি হয়– আপনারা চেনেন না? সারা বাংলাদেশের লোক তাদের চেনে। স্থানীয় দুজন পুলিশও এই কাজে সহায়তা করেছে, দ্বিতীয়বারও ওকে এখানকার হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছে, কাতরে কাতরে চিকিৎসার অভাবে মেয়েটা মরে যাচ্ছিল, তারপরও আপনারা কোনো টুঁ শব্দ করেন নি। দশদিন পর এলাকা থেকে ঢাকায় খবর পেয়ে ওরা এসে ওকে নিয়ে গেছে, আপনারা কেউ তার সাথে পর্যন্ত যান নি, কেমন বাবা আপনারা? কেমন মা?

মাঝবয়সী তোতাপাখির মতো বলে– ঢাকা গিয়া কী করুম? আমাগো কি আর চিকিৎসা করার মতো টাকা আছে?

অভিনব কায়দায় ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়ে মিলির অস্তিত্বের মধ্যে এতক্ষণ বিষফোঁড়ার মতো লেগে থাকা ছোকড়াটা ঘুরে দাঁড়ায়, মনে অয়, আমারে শরম পাইতাছে। আপনারাও শরম পাইতাছেন। 'ধর্ষণ' না কইয়া কইতাছেন 'অত্যাচার' আমি বরং টি স্টলে যাই, আপনেরা মন খুইল্যা কতা কন... বলে একটি কিশোরীর গালে টোসকা মারে, কী রে মজিদা? এমনে তো তর বকর বকরের ঠেলায় টিকন যায় না, অহন একবারে জবান বন্ধ হয়া

গেল যে? বসে মৌজ করে। হাঁটতে হাঁটতে পেছনে মাথা ঘুরায়, ঘড়ি দেইখ্যা লইয়েন আপা, শহরে ফিরবেন, রাইতের রাস্তাঘাট, কুন ঠিক নাই...। লোকটার ইঙ্গিতের মধ্যে গা ছমছম করা অনুভব যেমন তার প্রস্থানে মিলি হাঁপ ছেড়ে বাঁচেও তেমন। কিন্তু সে হঠাৎ ভেবে তল পায় না, ওদেরকে অকপট কথা বলার সুযোগ দিয়ে চলে গেল কেন?

বাঁশঝাড়ের নিচে কিশোরের ছায়া। বড় রহস্যজনকভাবে কচি ডালগুলোর ঝোপে নিজেকে আড়াল করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সে। মিলি যখন ওদিকে তাকিয়ে তারেক দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে।

বৃদ্ধের যেন সংবিৎ ফিরে, সালেমা, ঘরের মোড়াডা নিয়া আয়। দেখুন, শেফালির ওপর দিয়ে যা ঘটে গেছে, ও যে এরপর প্রাণে বেঁচে আছে সেটা একটা রীতিমতো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার তারেক বলে, দয়া করে আপনারা ওর বাকি জীবনটা বাঁচান। বৃদ্ধ অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকায়, আ..মরা? বাঁচানির মালিক তো আল-হ...। আপনাদের কোনো ভয় নেই, কতগুলো অসভ্য জানোয়ার আপনার মেয়ের জীবন নষ্ট করবে, আপনারা তাদেরকে সাহায্য করবেন? মামলা করেন নি মানলাম, কোর্টে গিয়ে বলবেন, কারা করেছে তা আপনারা জানেন না?

মাঝবয়সী এবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কেন আপনেরা ঢাকা থাইক্যা আইসা আইসা আমাগো বিপদ বাড়ান, যা হওয়ার তা তো হইয়াই গেছে।

কিশোরী দুটি জড়াজড়ি দাঁড়িয়ে দু'চোখ দিয়ে সেই একই ভয়ার্ত আকুতি প্রকাশ করে।

যা হওয়ার তা হয়ে গেছে– কী সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া মিলির রোমকূপ ধরে হিমস্রোত বয়ে যায়।

দিনাজপুরের ধর্ষিতা হয়ে আত্মহত্যা করা ইয়াসমিনের মা'র উক্তি মনে পড়ে, কাল পেপারে এসেছে কত সরকার আইল গেল, কত জনে কত আশ্বাস দিল, অহনও আমার মাইয়ার মরণের বিচার পাইলাম না। মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার অ্যাডভোকেট সামিয়া রহমানের কথা মনে পড়ে, তিনি প্রায় পুরোপুরি হতাশ মিলিকে বলেছেন, দেখুন আমরা অনেক তদন্ত করেছি, ওর ফ্যামিলি কোনোভাবেই কো-অপারেট করছে না। বাকি দুটি মেয়েকেও থ্রেট করা হচ্ছে। অবস্থা যা দেখছি, বিপক্ষদল হেভি স্ট্রং। এরা শেফালির বাবা-মাকে কোর্টে এনে উল্টো নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার শক্তিও রাখে।

তারপরও মিসেস আইরিন রহমানের মিলির প্রতি আত্মবিশ্বাস, আমার মনে হয় তুমি পারবে, ইমোশনাল পয়েন্ট দিয়ে যে কোনোভাবেই হোক ওদের তুমি কনভিনসড করবে। দেশে যেভাবে রেপ আর এসিডের মড়ক এসেছে, একটা দুটো বিচার না হলে একদিন তুমি আমিও সেই অন্ধকারে তলিয়ে যাব।

কুমিল-া জেলার চান্দিনা থানাতেও তো এক নবম শ্রেণীর কিশোরীকে সারারাত গণধর্ষণের পর এসিড ঢেলে পাষণ্ডগুলো হত্যা করেছে। একই অবস্থার শিকার। কই? তাকে নিয়ে তো হৈচৈ হয় নি? কেন কোন কারণে কোন ঘটনাটি ক্লিক করে মিলি তার আগাপাস্তলা খুঁজে পায় না। তবে একটা সূক্ষ্ম কারণ অবশ্য আছে, শেফালি প্রতিবাদী মেয়ে ছিল। লেখাপড়ার প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। কৃষক দরিদ্র বাবা মা এমন কি তার আত্মীয়রা পর্যন্ত চাইত না সে পড়ুক। সেলাই ফোঁড়াই করে টাকা জোগাড় করে পড়ে সে যখন ক্লাস টেনে ফার্স্ট হলো, সিকদারের বার বার ফেল করেও শিক্ষককে ছুরির মুখে রেখে এতদিন পাস করে আসা ছেলেটি সেবার ফেল করলো।

তখন স্কুলে নতুন শিক্ষক এসেছে। চড়ে গেল সেই ছেলে, যার নাম মন্টু, এরপর থেকেই শুরু হলো অত্যাচার। প্রথমেই সে নতুন শিক্ষককে খুন করে রীতিমতো গুম করে ফেলল। তার সাথে পুলিশদের খুব দহরম মহরম ছিল। এরপর রটিয়ে দেয়া হলো, ব্যাচেলার হিন্দু শিক্ষক সতীশ চন্দ্রের সাথে শেফালির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ছুটির পর মন্টুরা ওদের হাতে নাতে ধরে ফেলায় সতীশ নাকি লজ্জায় পালিয়ে কোলকাতা চলে গেছে।

গঞ্জ থেকে পেপার এনে পড়া শেফালি ছিল চোখ-কান খোলা মেয়ে। সে মাঝে মধ্যে পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে লিখত। সতীশের খুন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পত্রিকায় সে লেখা পাঠায়। তাতে একটা প্রতিক্রিয়া হয়, ঊর্ধ্বতন মহল থেকে স্থানীয় পুলিশদের ওপর চাপ আসে বিষয়টি তদন্তের জন্য।

পুলিশরা মন্টুদের ওপর জনতাকে দেখানোর জন্য নাটকীয় হম্বিতম্বি করে শেষে ওপরে রিপোর্ট পাঠায়, পুরো চিঠিটিই নিজেকে লজ্জা থেকে রক্ষা করার জন্য শেফালি বানিয়ে লিখেছে।

শেফালির বাবাকে পেটানো হয়, মাকে জনসমক্ষে কান ধরে মেয়ের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়, এবং শেফালিকে যেন রসিয়ে খাওয়ার জন্য প্রথমেই কোনো অ্যাকশানে না গিয়ে কেউ তার ওড়না ধরে টানে, সামনে দাঁড়িয়ে কামিজে টান দিয়ে তার ভেতর পিঁপড়ের দলা ছেড়ে দেয়, একদিন মন্টু কষে তার ডান আঙুলে কামড় বসিয়ে বলে, গোবরের মইধ্যে বইয়া লেখিকা হওনের খোয়াব? খাড়া তুই, আঙুল দিয়া কেমনে লেখছ তার খায়েশ আমি...। ওর পেটের মধ্যে লাথি দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে শেফালি বলেছিল, তুই কী কুত্তা নাকি, কামড় দিতাছস, হাত কাইট্যা কী করবি আমার? আমি ঠ্যাং দিয়া হইলেও লিখুম।

যে দেশে হাজারো অসহায় নিরপরাধ নারী হাত পা ধরেও যৌতুক, ধর্ষণ, আগুনে পুড়িয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না, শত আপোসেও মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না, সেখানে শেফালির আচরণ তো তাহলে চরমভাবে ক্ষমার অযোগ্যই।

পরিবার গ্রামের মানুষের প্রচণ্ড বাধার মুখে ওর স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়। এরপরই এক রাতে ওকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে ফাঁকা স্কুলের মধ্যেই শুরু হয় মন্টুদের আনন্দোৎসব।

অ্যাডভোকেট সামিয়া রহমান চিঠিপত্র বিভাগে ওর চিঠি পড়েছিলেন। শেষে শেফালির এই পরিণতির খবর পেয়ে তিনিই উদ্যোগ নিয়েছিলেন ওকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার।

দিঘির তরঙ্গ বেয়ে ছুটে আসা এক ছিটকে ভেজালু বাতাস মিলির মুখ আর্দ্র করে তোলে। চারপাশে ধানকাটা মানুষের ঘরে ফেরার খোল করতাল, মিলির সংবিৎ ফেরে তারেকের কথায়, শেফালিকে যখন প্রথম অত্যাচার করা হয়, সে হাসপাতালে শুয়ে একটা চিঠি লিখেছিল, কারা, কীভাবে সেই অত্যাচার করেছে, অনেক কষ্টে সে আমাদেরকে সেই কথা বলেছে, আপনারা জানেন, সেই চিঠি কোথায়?

বৃদ্ধ মাথা নাড়ে– না।

মিলি অসহিষ্ণু– এইভাবে চুপ থেকে আপনারা আপনাদের এই দুই মেয়েকে বাঁচাতে পারবেন?

মুড়ি গুঁড় আসে।

মিলি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ইমোশনাল জায়গাতে যেতে চায়, মাঝবয়সীকে বলে, শেফালির জন্মের সময় আপনার খুব কষ্ট হয়েছিল, না? আম্বিয়া খাতুন কিছুক্ষণ বিমূঢ় থাকে, তারপর যেন একটা ঘোরে পড়ে যায়, না। একটুও না। কোনো দাইও লাগে নাই। মাথায় ধান তুইল্যা ঘরের মইদ্যে ঢুকছি, আতকা দেহি আমার শইল্যের মইদ্যে কুন ভার নাই।

বাচ্চার কান্দা শুইন্যা নিচের দিকে চায়া দেহি ওমা, আমার জাদু ময়না আমার ঠ্যাংয়ের কাছে গড়াগড়ি খাইতাছে... বলতে বলতে আনন্দ এবং বেদনায় তার চোখ ভিজে উঠতে থাকে।

ও খুব দুষ্টামি করত ছেলেবেলায়?

এইবার বৃদ্ধ নড়েচড়ে বসে, পয়লা পোলা না হউনে আমি খুশি আছিলাম না, কিন্তু মা লক্ষ্মী হেই ছোটকালেই আমার বেবাক দায়িত্ব নিয়া নিল। বাইরে থাইক্যা আইলে ভিজা ন্যাকড়া দিয়া আমার পাও মুছায়া দিত, ঘাম মুছায়া দিত...এইবার বৃদ্ধের চোখ জলার্দ্র।

তারেক বিহ্বল হয়ে মিলির দিকে তাকায়। বিকেল হেলান দিচ্ছে, আসমানে ঘুমমেঘেদের শিথিলতা লাল রোদ্দুরের সাথে মিলেমিশে চারপাশ বিষণ্ন করে তুলেছে। সম্মুখে রাত্রি।

মিলির কোনো বিকার নেই, সে প্রচণ্ড আশাবাদ নিয়ে এ দুটি নর-নারীর মুখোমুখি, তারপর?

আম্বিয়া খাতুনের মুখে আলো, হারাদিন অরে বহায়া কাম করতাম। খিদা লাগলেও কুনদিন

কানত না। কী যে আজিব মাইয়া আছিল, টিপ মাইরা বইয়া থাইক্যা সিলেটের মইদ্যে মাটির ঢেলা দিয়া পাখি, ফুল এইগুলান আঁকত।

বড় হওয়ার পর?

ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে বৃদ্ধের মুখ, বড় হয়াই তো সর্বনাশটা হইল। ব্যাটা গো মতন অইব, পড়াশোনা করব, আরে ফকিন্নীর ঘরে বইয়া লেহাপড়া কইরা তর কী অইব? কুন লাট সায়েব তরে বিয়া করব? হেইতো তরে কুন এক কামলা বেডাই বিয়া করত, তহন... বলে যেন বৃদ্ধ চারপাশে আঁধারে মিশে থাকা রাক্ষসগুলোকে দেখে– অনেক হইছে। আপনারা যান। ওর ভাগ্যে যা আছিল হইছে, কারা কী করছে হের কুন পরমান আমাগো কাছে নাই, মামলা বিচার এইগুলান কইরা কিচ্ছু অইব না। বহুত অইছে, যান।

কিশোরী দুজনের হঠাৎ কৌতূহল– আপনারা কি স্বামী ইস্ত্রি?

মিলি হেসে ফেলে, না, সহকর্মী, বুঝলে না তো? আমরা এক অফিসে এক সাথে কাজ করি।

অ... ভয়ে কুঁকড়ে আঁধার হয়ে থাকা মেয়ে দুটি নিজেদের এই প্রশ্নে লজ্জায় রক্তাভ হয়ে হাসে। বাঁশঝাড়টা পেরোনোর সময় এক অসহ্য পরাজিত রক্তস্রোত মিলির ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করে রাখে। তার ভারি পা যেন সামনে চলে না। অস্ফুটে তারেক বলে– পুরো মিশনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

বিষাক্ত রোদ গিলতে গিলতে হিম নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি। সব ঘর ছায়া করতে করতে পাখা মেলছে কলরবরত পাখিরা।

যেন ভুঁইফুঁড়ে সামনে এসে পড়ে বাঁশঝাড়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা সেই কিশোর। মিলি স্নায়ু দিয়ে কী জানি কী আন্দাজ করে, প্রশ্ন করে– তুমিই বাবলু?

হ। ছেলেটির ঘাড় উদ্যত। চোখ জ্বলজ্বল করছে। কোঁচড় থেকে বের করে একটি কাগজ। এই চিডিটাই হাসপাতালে শেফালি বু লিখছিল। বহুত ডরাইছি, আর ডর করে না।

মিলিদের চোখের সামনে ধেয়ে ওঠা এক দমকা বাতাসে কিশোরটির চুল দাউ দাউ করে উড়তে থাকে। ❏
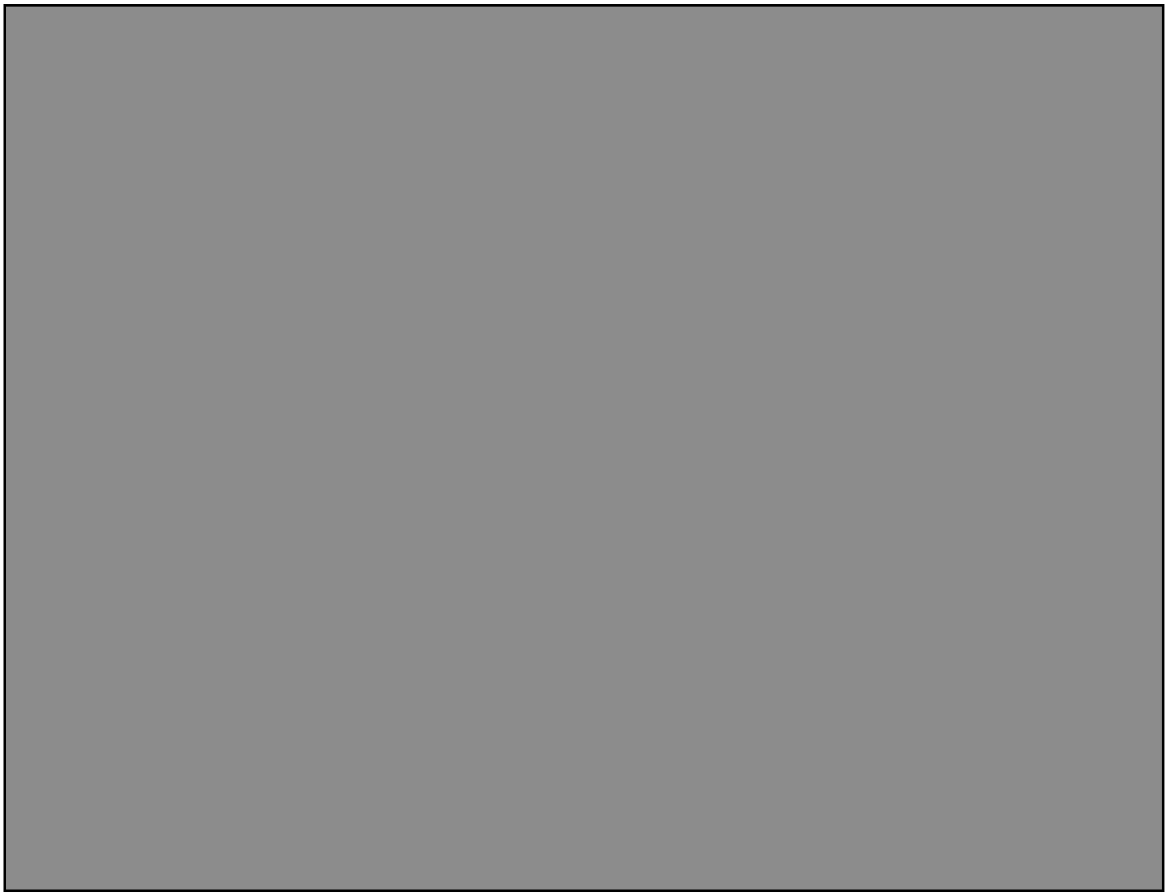
ঢাকা।